ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর
নিবেদন—
দেবর

পর্দ্দার অন্তরালে

কাহিনী ও পরিচালনা :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতকার	:	প্রণব রায়
সুর-শিল্পী	:	সুবল দাশগুপ্ত
চিত্র-শিল্পী	:	অমল সেনগুপ্ত
শব্দযন্ত্রী	:	জে. ডি. ইরাণী
সম্পাদক	:	বিনয় ব্যানার্জ্জী
রাসায়ণিক	:	ধীরেন দাশগুপ্ত
কারু শিল্পী	:	পাঁচুগোপাল দে
শিল্প নির্দ্দেশ	:	তারক বসু
সহকারী পরিচালক		পশুপতি ভাদুড়ী
ব্যবস্থাপনা	:	সুধীর সরকার
প্রচার সচিব	:	অজিত সেন

যমুনা দেবী
অহীন্দ্র চৌধুরী
ছবি বিশ্বাস
জহর গাঙ্গুলী
ইন্দিরা রায়
রমা দেবী
ইন্দু মুখার্জ্জী
তুলসী চক্রবর্ত্তী
বেচু সিংহ, শ্যাম লাহা, আশু বসু
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়
কুমার মিত্র, ললিত চট্টোপাধ্যায়
পুলিন সরকার, ফণি রায়
এবং আরো অনেকে।

পরিচয়-লিপি

ঃ কাহিনী ঃ

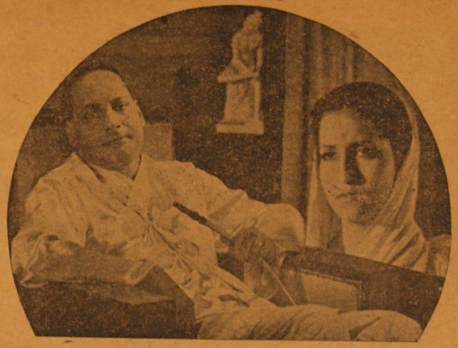

সুখের সংসারে দুটি প্রাণী—স্নেহশীল ভাই সুরেন। সে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, আর স্নেহময়ী ভগ্নী নমিতা, কলেজের ছাত্রী।

সংসারে ভালবাসে সবাই—নমিতাও বেসেছিলো। কিন্তু সে ভালবেসেছিল এক পরিচয়হীন শিল্পীকে। তার সংবাদ জীবনে সুরেন জানতে পারেনি।

সুখেই ছিল দুটি ভাই-বোনে মিলে। কিন্তু চিরদিন যখন কারো সমান যায় না—সুরেনেরও গেল না। সুধীর নামে এক ভীষণ চরিত্রের লোক কুগ্রহের মত বেচারীর পিছু নিল। প্রথমে মিলিত হলো পরস্পরে বন্ধু হিসাবে। তারপর অসতের সঙ্গ-ফলে কৌতূহলী সুরেন একদিন ব্যাঙ্কের বিশহাজার টাকা ভেঙে জেলখানার দরজায় পা বাড়িয়ে দিল। তার কৈফিয়ৎ—তার উদ্দেশ্য ছিল মাত্র ভাগ্য-পরীক্ষা করা।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সুরেনের ছিল কলেজের সহপাঠী, তাই বন্ধু-প্রীতির খাতিরে সুরেন সাতদিনের সময় পেলো টাকা পরিশোধ করবার। কিন্তু টাকা কোথায়? সংসারে চারিদিকে তাকিয়ে সে শুধু তার

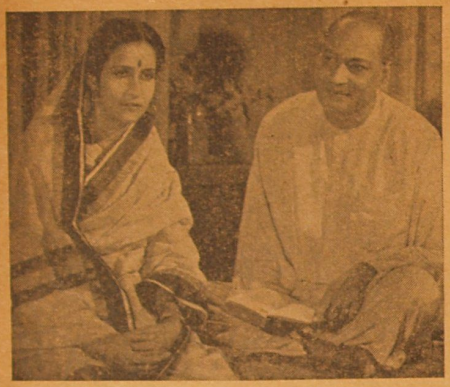

পৈত্রিক বাড়ী খানাই দেখ্‌তে পেলো যার বিনিময়ে সে মুক্তি পে তে পা রে।... দুর্ভাগ্যের দুর্য্যোগে মানুষ হাতের কাছে যা পায়, তাই আঁকড়ে ধরে—ভাঙা বুকখানাকে তাই সে কোনমতে বয়ে নিয়ে গেল বন্ধু সুধীরের কাছে। সুধীর সান্ত্বনা দেয়—সে তার বাড়ী বিক্রী করিয়ে দেবে—তাকে সংসারে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পথও দেখিয়ে দেবে।

কি ন্তু এ ত ব ড় দুর্ভাগ্যের কথাটা তখনও পর্য্যন্ত নমিতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল—কারণ, সুরেন হল তাদেরই একজন—যারা বিরাট ছায়াময় বৃক্ষের মত, দশজনকে শুধু শান্তি দিয়েই ধন্য হয়, নিজের মাথায় শত-শত বিপর্য্যয় বিপত্তি নিঃশব্দে বহন করে। তাই একজন যখন দুর্গতির দুর্ভাবনায় অস্থির, আর একজন তখন ভালবাসার চিন্তায়

দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও উদ্বেগ, সেখানেও ব্যথা। অন্তরের এ যে কি অনির্ব্বচনীয় হাহাকার, সে শুধু নমিতাই জানে! কাছে এসে ধরা দিয়ে তার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ পালাতে চাইল বহুদূর। হঠাৎ তাকে যাত্রা করতে হলো সমুদ্রপারে কোন্ একটা শিল্প-সম্মিলনে আহূত হয়ে। যাবার সময় শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল বিদেশ থেকে ফিরে এসে সে তার দাদার কাছে নিজের পরিচয় দেবে—তারপর একদিন শুভলগ্নে তাদের হবে বিয়ে।

কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে বসে সেদিন নমিতার ভাগ্য-সূত্রটি গ্রথিত করলেন এক নির্ম্মম পরিহাসের দুর্নিবার ভবিতব্যের বন্ধনে!

সুরেনের বাড়ী বিক্রীর ব্যবস্থা সুধীর করেছে প্রচুর অর্থশালী বিপত্নীক এক বৃদ্ধ যোগেনবাবুর কাছে। তিনি একদিন তাঁর ম্যানেজার বিশ্বম্ভর-বাবু আর সুধীরের সঙ্গে সুরেনের বাড়ী দেখ্‌তে এলেন আর সেই সঙ্গে তন্বী যু ব তী নমিতাকেও বিশেষ করে দেখে গেলেন। তাঁর ম্যানে-জার বিশ্বম্ভরবাবু ভাব্‌লেন এ যোগাযোগ ত মন্দ নয়। কিন্তু সুধীরের মারফত সুরেনের কাছে যোগেনবাবুর সঙ্গে নমিতার বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে—সুরেন একে-বারে অস্বীকার করে বলে— এ যুগে বৃদ্ধের বিবাহ করবার অধিকার আছে নাকি? না না, জেনে শুনে সে তার আদরের নমিতাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারবে না।' কিন্তু পারতে তাকে হোলো—কেননা

সুরেনের বিপদের কথা নমিতার কাছে আর লুকানো ছিলনা। সেও পণ করলো তার একমাত্র স্নেহময় দাদাকে যেমন করেই হোক জেল থেকে বাঁচাবেই। আর সে পণ—সে রক্ষা করলে, তার সারাটা জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দের বিনিময়ে বৃদ্ধ যোগেনবাবুকে বিয়ে করে!—কিন্তু আশ্চর্য্য, তখনও সে রবীনকে ভালবাসে!

অতএব সুরেন আর জেলে গেল না। তার পৈত্রিক ভিটাটাও রক্ষা হোলো। যোগেনবাবু শ্যালককে বিশ হাজার টাকা দান করলেন—কিন্তু নমিতা হারাল তার সর্ব্বস্ব!

তারপর এলো নমিতার জীবনে স্বামীগৃহ-বাস—সে এক নিদারুণ বিড়ম্বনা। একদিকে স্ত্রীর কর্ত্তব্য. আর একদিকে প্রেমের দীর্ঘশ্বাস। অনেক চিন্তার পর অনেক সাহস সঞ্চয় করে সে একদিন স্বামীকে বললে, "আমি আধুনিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি, মনে তাই আমার রঙীন নেশার ছোপ ধরেছিল। এই মন কেবলি চেয়েছিল বলাকার মত নিরুদ্দেশে পাখা মেলতে—কল্পনার কুঞ্জবনে কার হাতে যেন রাঙারাখী পরাতে, কিন্তু আজ তার সেই যাত্রাপথে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে—সে পাখা আজ ভগ্ন!...তাই আমাকে কিছুদিন সময় দিন আমি নিজেকে আপনার স্ত্রী হবার যোগ্য করে তুল্‌বো—আমার রূপালী মায়ার স্বপ্ন-সৌধ নিজের হাতে ভেঙে দিয়ে!" যোগেনবাবু হাসিমুখে এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। কিন্তু একবার যাকে হৃদয় দান করা যায়, তাকে ভুলে যাওয়া কি সহজ কথা?

তবু এই অন্তর্দ্বন্দে জয়ী হলো নমিতা—চিরন্তন নারী-হৃদয়ে আঘাত করলো সহানুভূতির অমোঘ স্পর্শ—স্বামীর অসহায় আত্মভোলা অবস্থা দেখে ব্যথা পেল নমিতা নিজের অন্তরে। তাই দূরের নমিতা হয়ে উঠ্‌লো অন্তরতম প্রেয়সী—সেইদিন থেকে ভার নিলো সে তার স্বামীর সবকিছুর একান্ত স্ত্রী-রূপে।

এইভাবে নমিতার হয়ত শান্তিতেই কেটে যেতে পার্‌তো, —কিন্তু একদিন নমিতা শুন্‌লো —যোগেনবাবুর ছোট ভাই, যে ছিল এতদিন বিলাতে—সে কাল আস্‌বে। নমিতা দেখ্‌লো তার সকল বিশ্বাসের পরপারে তার স্বপ্নের অগোচরের ঘটনা আজ ঘটে গেছে—! যে এলো, সে আর কেউ নয়, তার সেই রবি! স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো নমিতা,—আর রবীন্দ্র দেখ্‌লো তার পূজনীয় অগ্রজের স্ত্রীরূপে তারই নমিতাকে! সবটা জড়িয়ে যেন এক দুঃস্বপ্নের কাহিনী—যেন কোন্ ইন্দ্রজালের রচনা! চিন্‌লো তারা দুজনে দুজনকে—বিষিয়ে উঠ্‌লো রবির মন বিগত ঘটনা স্মরণ করে—নমিতাকে পারলো না সে ক্ষমা কর্‌তে তার বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে। এ বাড়ীতে সে থাকে কেমন করে—যেখানে নমিতার সাহচর্য্য অহরহ তাকে ঘিরে থাকতো প্রতিনিয়ত?

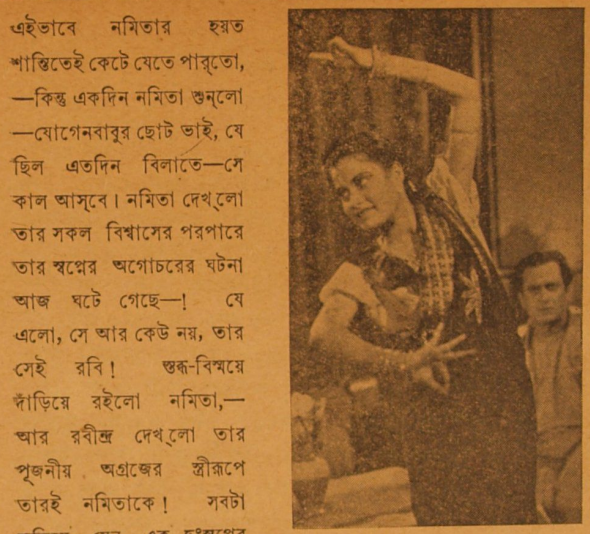

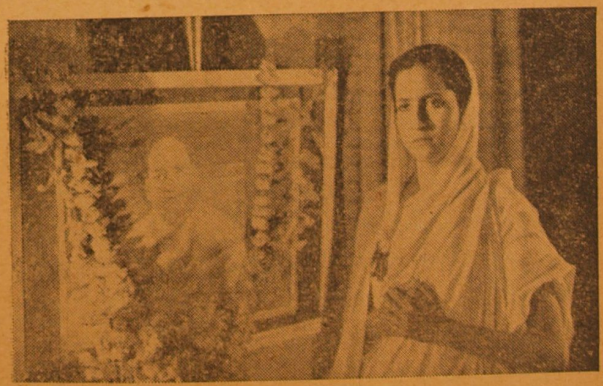

তাই সে যোগেনবাবুর শত অনুরোধ উপেক্ষা করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল মর্ম্মাহত হোয়ে।

ওদিকে নমিতার এই বিবাহ-ব্যাপারে সুরেনের হৃদয় গেল ভেঙে। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে সে পড়্লো একেবারে নুয়ে। ঠিক এই সময়ে জীবনে সে পেল এক নূতন আস্বাদন—আর এক হৃদয়ের কাছ থেকে—তার নাম চন্দ্রা—একটি ভাগ্যহারা স্বামী-পরিত্যক্তা নির্য্যাতিতা মহিলা—সুধীরের আশ্রিতা। এই চন্দ্রার মেয়ে রেবা যখন ফিরে এল তার মায়ের কাছে, সুধীর দেখ্লো মেয়েটির শরীর যৌবনরেখায় প্রায় পহুঁচেছে—স্নিগ্ধ-শ্রীমুখখানি যদিও কাঁচা! সবার অগোচরে সে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাস্লো—কিন্তু চন্দ্রার কাছে তার এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিল হাস্য ধরা পড়ে গেল! তারপর একদিন চন্দ্রা বাধ্য হলো সুধীরের আশ্রয় ত্যাগ করতে—কিন্তু সে যখন মেয়ের হাত ধরে পথে দাঁড়ালো, সুরেন তখন নিয়ে গেল তাদের নিজের বাড়ীতে চন্দ্রাকে নমিতার শূণ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করতে।

এদিকে ভ্রাতৃগত প্রাণ বৃদ্ধ যোগেনবাবু শত চেষ্টাতেও ফিরিয়ে আন্তে পারলেন না রবীন্দ্রকে—পারলনা নমিতাও শাস্ত্র আর ধর্ম্মের সত্যিকারের যুক্তি দিয়ে! অতএব ছোট ভাইয়ের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার যোগেনবাবুর পক্ষ্যে সহের অতীত হ'য়ে দাঁড়াল—পাকানো জট তিনি যত চাইলেন খুল্তে—ততই তা জটিল হ'য়ে উঠ্ল। ফলে তাঁর মনের সঙ্গে শরীরও ভেঙে পড়্লো—বেচারী অভিমান করে সেই যে শয্যাগ্রহণ করলেন, আর উঠ্লেন না। অভিমান করেই তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে গেলেন—স্ত্রী নমিতার নামে।

বিধবা নমিতার ত জীবনে সব আশা

আনন্দই ঘুচ্লো—কি করবে সে সেই সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারিণী হয়ে—ঐশ্বর্য্য দিতে পারল না তাকে আনন্দ বা শান্তি। তাই সে আবার উইল করলে রবির নামে—ফিরিয়ে আনতে গেল ঘরের ছেলেকে ঘরেতে। কিন্তু রবির আকাঙ্ক্ষা তার দাদার সম্পত্তি লাভ নয়—তার চাওয়ার আশা সীমাকে ছাড়িয়ে গেল! দুঃখে ক্ষোভে নমিতা বল্লে, "আগের যুগের মেয়ে হলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যেতাম!"

তার পরের ঘটনা ঘটলো এই যে, রবি পড়্লো অসুখে—নমিতা শুনে তাকে নিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে—প্রাণপাত যত্নে ও শুশ্রূষায় সেরে উঠ্লো রবি। এইবার সে জানতে পারল—নমিতার কাছে তার পাওনা কি এবং কতখানি! নমিতার স্নেহ-যত্নের প্রচুর্য্যের ভেতর এলিয়ে দিল নিজেকে নিতান্ত অসহায় বালকের মতো—আর মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এলো—করুণ আহ্বান—'বৌদি!'

এতেও কিন্তু নমিতার মন ভর্লো না—তাই তার শেষ দাবী একদিন তার "দেবর"কে দিতেই হলো! সমাজের রীতিনীতি ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার বিপ্লবী রবীন্দ্র একদিন এক নির্য্যাতিতা সমাজ-পরিত্যক্তার মেয়েকে বিবাহ করলো।

অতএব শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল "দেবর"—তার বৌদিকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে এতটুকুও কার্পণ্য কর্ল না!

গান

(১)

কুহু কুহু আমি গানের পাখী
ফাগুণ বনে আমি লুকায়ে ডাকি।
আমার গানে জুঁই চামেলী
কাননে জাগে হৃদয় মেলি,
আমার গানে দোলা লাগে প্রাণে
বাঁধে অলখ-রাখী।
মোর কথার ফুলে গাঁথা গানের মালা
কারে দেব তাই ভাবি নিরালা।
আমার এ গান তারি লাগিয়া
রঙ্গে রঙ্গে যে রাঙ্গালো হিয়া,
যার আঁখির তারায় চেয়ে পলক হারায়
আমার আঁখি।

(২)

এ নহে কুসুম এযে ভালোবাসা মোর
ওগো সুন্দর চিত-চোর
আমার মনের গোপন বিজন বনে
এ ফুল ফুটেছে মধুর ফাগুণ ক্ষণে,
তারি মালা গেঁথে পরাণে তোমার
বাঁধিনু অলখ-ডোর।
বন্ধু, তোমার দেশে
দূর হতে আজ আমার ফুলের
সুরভি যায় কি ভেসে।
আমার এ ফুল নিশিগন্ধার সম
তোমারি আশায় নিশি জাগে প্রিয়তম,
বিরহ শয়নে মিলন স্বপনে
রজনী হয় যে ভোর।

(৩)

খেলাঘর ভেঙ্গে দাও, খেলা হোক অবসান
এ শুধু মিনতি মোর এ তো নয় অভিমান।
দু'দিনের পরিচয়
শুধু, মনে কোরো অভিনয়
ভুলিও স্বপন সম সেদিনের হাসিগান।
যদি, ভুল করে কোনোদিন জল আসে
আখিপাতে
স্মৃতি সে জলের লেখা, মুছিও আপন হাতে।
চলে যাই যদি দূরে
বেঁধো, বীণাখানি নব সুরে
অতীত দিনের লাগি যেন কাঁদেনা তব পরাণ।

(৪)

ফাগুণ কুঞ্জবনে মধুর গুঞ্জরণে
রুম ঝুম ঝুম বাজলো নূপুর ;
নয়নে মোর আবেশ জাগে
মন যমুনায় দোলা লাগে,
আকাশ আমার রাঙ্গিয়ে গেল
নাচে মনের ময়ূর।
কোন সুন্দর এলো আজ আমার পথে
মোর কুসুম চাহে তার মালা হতে,
মনের বনে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
চঞ্চল বাঁশীর সুর।

(৫)

ছিল হাসি ছিল গান,
ছিল বনে ফুল মেলা
আমার জীবনে ছিল
মধুর বসন্ত বেলা,
সেই ভুলে যাওয়া স্মৃতি
আজো পড়ে গো মনে।
কবে বাঁশী বেজেছিল
জীবনের মধুরাতে
প্রথম কুসুম-রাখী
বেঁধেছিনু কার হাতে,
আজ গেছে প্রেম গেছে গান
মধুরাতি গেছে চলে
উদাসী বসন্ত গেছে
ঝরাফুল পায়ে দলে,
সেই ঝরাফুল বনে অলি
কাঁদে গোপনে।

বক্স অফিসে
জন প্রবাহ
বহাইবার মত
কয়েকটি বাংলা ছবি—

- জয়দেব
- সত্য-পথে
- পথিক
- রাস-পূর্ণিমা
- শকুন্তলা
- ব্রাহ্মণ-কন্যা
- শ্রীরাধা
- ভীষ্ম
- মিলন

আপনার চিত্র-গৃহে কোন্ তারিখে কোন্ ছবি
দেখাবেন—অবিলম্বে তা ঠিক করে ফেলুন,
এবং নীচের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

একমাত্র চিত্র-পরিবেশক :
রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার
৩নং সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর প্রচার বিভাগ হইতে **শ্রীঅজিত সেন,** এই প্রোগ্রাম পুস্তিকাখানি সম্পাদনা এবং প্রকাশিত করেছেন।

মীরা [illegible]পাধ্যায়
অজি[illegible]াধ্যায়
১৮/বি, অ[illegible]ন্দ্র ব্যানাৰ্জ্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি. অবিনাশ চন্দ্র ব্যানাৰ্জ্জী লেন.
কলিকাতা-৭০০০১০

আসিতেছে !

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর
আর একখানি বাংলা
সমাজ কথাচিত্র !

কলঙ্কিনী

শ্রেষ্ঠাংশে:
রেণুকা, অহিন্দ্র
জহর, পূর্ণিমা
ও ধীরাজ

পরিচালনা - জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়